তৃতীয় অধ্যায়

মুরতাদ শাসক ও উম্মাহর দায়িত্ব

ভূমিকা

ফতওয়া

মুরাতাদ শাসককে হটিয়ে তার স্থানে মুসলমান শাসক নিয়োগ দেয়া মুসলমানদের উপর ওয়াজিব

কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল:

দলিল নং ১:

‘‘যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’’

আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) এর ব্যাখ্যা:

দলিল নং ২:

‘‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’’

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা:

দলিল নং ৩:

‘‘আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়’’

আল্লামা আবু বাকর জাস্‌সাস (রহঃ) ব্যাখ্যা:

সুন্নাহ থেকে দলিল:

দলিল নং ১:

“হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও”

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) এর মত:

দলিল নং ২:

“হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবোনা?”

দলিল নং ৩:

“না। যতক্ষণ না তারা নামায আদায় করে”

উক্ত হাদীস সমূহের আলোকে কাযী ইয়াদ (রহঃ) এর মত:

উক্ত হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম নববী (রহঃ) এর মত:

দলিল নং ৪:

“যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠা রাখে”

দলিল নং ৫:

“কোন হাবশী গোলামকে তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করে নিয়োগ দেয়া হয়”

ইজমা থেকে দলিল

চার মাযহাবের ফকীহগণের (রহঃ) ফতওয়া:

ফিকহে হানাফী

১.ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৪. হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৫. আল্লামা তক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে শাফি‘ঈ

১. কাযী ইয়ায (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতওয়া:

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৫. আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে মালিকী

১. ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. আল্লামা কুরতূবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. কাযী ইবনুল আরাবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৪. ফকীহ ইবনুত তীন (রহঃ) এর ফতওয়া:

৫. আল্লামা শানকিতী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ফিকহে হাম্বলী

১. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. কাযী আবূ ই‘য়ালা (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া:

উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতামত

১. দামেশ্‌কী (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. আল্লামা শাওকানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. মুহাম্মাদ রশীদ রেজা (রহঃ) এর ফতওয়া:

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ) এর ফতওয়া:

নজদী আলেম গণের ফতওয়া

১. শায়েখ আহমাদ বিন আতীক নাজদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. শায়েখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর ফতওয়া:

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ আব্দুল্লাহ দুমাইজী (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. উস্তায আব্দুল কাদের আউদাহ্ (রহঃ) এর ফতওয়া:

৩. ড.সলাহ দাবূস এর ফতওয়া:

মুজাহিদীন আলেম গণের ফতওয়া

১. শায়েখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ) এর ফতওয়া:

২. শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী (দা:বা:) এর ফতওয়া:

৩. শায়েখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

কেয়াস থেকে দলিল

এক. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কেয়াস।

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা:

আবূ হুরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত:

ইমাম নববী (রহঃ) এর মত:

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন:

ইজমা থেকে কেয়াস:

দুই. ফুকাহাগণের ইজমা থেকে কেয়াস।

সুদ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে ফুকাহাগণের মতামত

“তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো”

আল্লামা খাযেন (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেন:

ইমাম কুরতূবী (রহঃ) ব্যাখ্যা করেন:

আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) ব্যাখ্যা করেন:

কর গ্রহণকারী শাসকদের ব্যাপারে জাস্‌সাস (রহঃ) এর অভিমত:

নামাজ রোযা সহ অন্যান্য ওয়াজিবাত পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত:

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন:

আল্লামা সা‘দী (রহঃ) বলেন:

আল্লামা ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন:

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন:

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন:

আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) বলেন:

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন:

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহঃ)বলেন:

ফুকাহাগণের উপরোক্ত ফতওয়ার সারমর্ম:

ফুকাহাগণের উপরোক্ত ইজমা থেকে কেয়াস:

ইতিহাস কী বলে?

এক. দৌলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে হুসাইন বিন আলী (রাদিঃ) এর জিহাদ।

দুই. আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাদিঃ) এর জিহাদ।

তিন. উমাইয়া শাসক ইসাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে জায়েদ বিন আলী (রহঃ) জিহাদী।

চার. আব্বাসী শাসক খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে আন-নাফসুস ঝাকিইয়া মুহাম্মাদ (রহঃ)এর জিহাদ।

পাঁচ. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর তৎকালীন জালিম উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হবার ফতওয়া প্রদান।

ছয়.উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে আব্দুর রহমান ইবনে আস-আছের জিহাদ।

সাত.উক্ত জিহাদের ব্যাপারে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ ফকিহ তাবিয়ীগণ (রহঃ) এর অভিমতঃ

ফকীহ আবী লায়লা (রহঃ) এর অভিমতঃ

শাবী (রহঃ) এর অভিমাত

আবুল বুখতারী (রহঃ) এর অভিমত

সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) এর অভিমত

তৃতীয় অধ্যায়

মুরতাদ শাসক ও উম্মাহ্‌র দায়িত্ব

সূচনা

মুসলিম দেশগুলোর মসনদ দখল করে রেখেছে আল্লাহদ্রোহী শাসকবর্গ। যারা তাদের সিংহাসন থেকে একের পর এক ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়ন করছে। কাফেরদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আলেম উলামাদের উপর চালাচ্ছে নির্যাতনের স্টীমরোলার। এ সমস্ত শাসকের হুকুম পাঠক পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এ ধরনের শাসকরা কি চিরকাল ক্ষমতার মসনদে থেকে তাদের অপকর্ম চালিয়ে যাবে, নাকি তাদেরকে অপসারণ করতে হবে? আর যদি অপসারণ করতে হয় তবে তা কোন পদ্ধতিতে?

এ ব্যাপারে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থান ও কর্ম পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের। কেউ বলছে তাদের অপসারণ আমাদের দায়িত্বে নয়। তাই তারা ব্যক্তিগত ‘আমাল করছে আর

ইমাম মাহ্দির প্রহর গুনছে। কোনো কোনো ইসলামী দল গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছে। কেউ কেউ চালিয়ে যাচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অবিরাম প্রচেষ্টা। অপরদিকে আল-কায়দা-তালেবানের মতো জিহাদী কাফেলাগুলো কুফ্ফারদের পাশাপাশি এ সমস্ত শাসকদের বিরুদ্ধেও লড়ে যাচ্ছে। সকলেই বলছেন তাদের উদ্দেশ্য হলো নবুওয়াতের আদলে খিলাফতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

তবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রস্তুতি ও অভিযান ছাড়া কোনো ভূখন্ডে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হয়নি। অন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। কিতাল ছাড়া কোনো ভূখন্ডেই শুধুমাত্র গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-জাগরণের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফাত কায়েম হয়নি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আলজেরিয়ায় ইসলামী দল বিপুল জন-সর্মথন (৮০%) নিয়ে ক্ষমতায় এসেও সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড) তো এর জ্বলন্ত নমুনা। যদিও তাদের অতীত ইতিহাস হলো বন্দী ও নির্যাতনের, রক্ত ও শাহাদাতের, কিন্তু তাদের ক্ষমতা লাভের মাধ্যম ছিল গণতন্ত্র। তারা ক্ষমতা লাভের পর এক বছর ক্ষমতায় টিকে থাকলো। তারা কি এই এক বছরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে? খেলাফততো দূরের কথা; মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তির মতো মানবীয় দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধগুলোও বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। তারপর কি হলো তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্য দিকে তালেবানের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। বর্তমানে সোমালিয়া, মালি, ইয়ামান, আফগান, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের অনেকগুলো অঞ্চল মুজাহিদদের

কিতালের মাধ্যমে বিজয়ী হয়েছে। এবং তাদেরই অধীনস্থ রয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকান, সেখানে কেউ কি ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ করার সাহস পাবে? প্রকাশ্য কোনো অপরাধ সেখানে কি সংঘটিত হচ্ছে? এতো গেলো বাস্তব পরিস্থিতি। কিন্তু শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর দায়িত্ব কী? তাদেরকে কি অপসারণ করতে হবে? হলে এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতি কী? এর উত্তর নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়।

ফতওয়া

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাফের কখনোই মুসলমানদের শাসক হতে পারে না। মুসলিম দেশের কোনো শাসক যদি শাসনভার গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং তার স্থানে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ইমাম নিযুক্ত করা মুসলমান জনসাধারণের উপর ওয়াজিব। আর যদি শাসক জালিম হয়, ইমামে আজম আবূ হানীফা (রাদিঃ) সহ অন্যান্য একাধিক নেককার সালাফদের মত অনুসারে তার বিরুদ্ধে কিতাল করে

তাকেও অপসারণ করা ওয়াজিব| তবে জমহুরের মতানুসারে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিতাল করা ওয়াজিব নয়।

কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস থেকে দলিল:

কুরআন থেকে দলিল:

দলিল নং ১:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"ولا ينال عهدي الظالمين"

"যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না|" (সূরা বাকারা: ১২৪)

আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন:

فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبي ص - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم

وكان قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول فإن لم يؤتمرله فبالسيف على ما روي عن النبي ص - وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان و رواه الأخبار ونساكهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال هو فرض وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ص - قال أفضل الشهداة حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل احكام القرآن

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য। সে খলিফাহ্ও হতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্বগ্রহণ করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে না। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই|" আয়াতটি এই প্রমাণও বহন করে যে, ফাসেক ব্যক্তি বিচারক হতে পারবে না। যদি সে বিচারকের পদ দখল করে, তাহলে তার বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না।

তিনি আরো বলেন: ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মত হলো 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' মুখ দ্বারা ফরজ। যদি তা মান্য না করে তাহলে তরবারি দ্বারা| যেমনটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ইব্রাহিম আস সায়েক যিনি খুরাসানের একজন ফকীহ, হাদিসের রাবি এবং বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবূ হানীফা (রহঃ) কে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ফরজ। অতঃপর তিনি তাকে ইকরিমা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত একটি

হাদিস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হলেন হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালীব এবং ঐ ব্যক্তি যে কোনো জালিমের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাকে আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার সম্পর্কে আদেশ করে৷ ফলে তাকে হত্যা করা হয়৷(আহকামুল কুরআন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৮৬)

নির্দেশনা:

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাস্সাস (রহঃ) বলেছেন: "জালিম ব্যক্তি শাসক হতে পারবে না।" যদিও এ ব্যাপারে ফুকাহাগণের মাঝে দ্বিমত আছে৷ তবে যে বিষয়টি বুঝে আসে তা হলো, জালিমের ব্যাপারে যদি এতো কঠোরতা হয় তাহলে কাফিরের ব্যাপারে কি হতে পারে৷

দলিল নং ২:

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة"

আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি।" (সূরা বাকারা: ৩০)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

الرابعة - هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة.ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الامة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك ودليلنا قول الله تعالى: " إني جاعل في الارض خليفة " [البقرة: 30]،وقوله تعالى: " ياداود إنا جعلناك خليفة في الارض[ص : 26]،وقال: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض " [النور: 55] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآية.

এই আয়াতটিই মূল ভিত্তি যে, এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করতে হবে যার আদেশ শুনা হবে, আনুগত্য করা হবে। যাতে তার দ্বারা কালিমা সমুন্নত হয়। খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে উম্মাহ্ ও আইম্মাহ্দের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, তবে শরীয়তের ব্যাপারে বধীর ব্যক্তি যদি কোনো মত প্রকাশ করে আর কেউ তার মত ও মাযহাবের অনুসরণ করে তার কথা ভিন্ন।

একইভাবে যে ব্যক্তি তারই সুরে কথা বলে। তার মত ও মাজহাব অনুসরণ করে। সে বলে, “দ্বীনের মধ্যে এটা ওয়াজিব নয় বরং বৈধ। উম্মাহ্ নিজেরাই তাদের হজ্জ্ব আদায় করবে। পরস্পর এর মাঝে ইনসাফ করবে। নিজেরদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হক দিয়ে দিবে। যাকাত, মালে ফাই, গণীমত তাদের অধিকারীদের নিকট বন্টন করে দিবে। যাদের উপর ‘হদ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন। (সূরা নূর: ৫৫) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচন করবেন। এ ধরনের আরো অন্যান্য আয়াত সমূহ”। (তাফসীরে কুরতূবী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬৪)

দলিল নং ৩:

মহান আল্লাহতা’আলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং সমস্ত দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফাল,আয়াত:৩৯)

যখন কিছু দ্বীন হবে আল্লাহ তা‘আলার জন্য আর কিছু হবে গাইরুল্লাহর জন্য, তখন কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য হয়ে যায়।

আল্লামা আবু বাকর জাস্‌সাস (রহিঃ) বলেন:

قال ابن عباس والحسن: "حتى لا يكون شرك". وقال محمد بن إسحاق: "حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه". والفتنة ههنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد; لأن الكفر إنما سمي فتنة لما فيه من الفساد، فتنتظم الآية قتال الكفار، وأهل البغي، وأهل العبث والفساد، وهي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية. (أحكام القرآن : 3 / 65).

ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাদিঃ) বলেছেন: “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহিঃ) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও অনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং আয়াতটির দাবী হলো, কুফফার, দুষ্কৃতকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৬৫)

সুন্নাহ্ থেকে দলিল:

দলিল নং ১:

উবাদা বিন সামেত (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

دعانا النبي صلى الله عليه و سلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية صحيح مسلم)

আমাদেরকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট বাইআত হলাম। অতঃপর তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হলো আমরা আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। (মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-ওজূবু তআতিল উমারা, হাদীস নং-৪৮৭৭)

যদি শাসকদের থেকে আমরা কোনো স্পষ্ট কুফর দেখতে পাই, তাহলে তারা আমাদের জন্য আর বৈধ্য শাসক হিসাবে বাকি থাকবে না। বরং তাদেরকে অপসারণ করে মুসলিম শাসক নিয়োগ দিতে হবে, যদিও তারা অন্য সকল ধর্মীয় বিধান পালন

করে ও দ্বীন ত্যাগের ইচ্ছা না করে। কেননা হাদীসের মাঝে বলা হয়েছে, “যদি তোমরা কোনো স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও” সুতরাং এখানে আমাদের দেখতে পাওয়াই যথেষ্ট, তাদের স্বীকারোক্তির কোনো প্রয়োজন নেই।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ) এ হাদীসের আলোকে বলেন:

ودل – أي هذا الحديث- أيضاً على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة, وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة, و إلا لم يحتج الرائي إلى برهان. (إكفار الملحدين)

এ হাদীসটিও প্রমাণ করে, আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয যদিও তারা কেবলা থেকে না ফিরে যায়, আর কুফরকে গ্রহণ ও ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছা ব্যতিতও কুফরের বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। অন্যথায় প্রত্যক্ষকারীর প্রমাণের প্রয়োজন পড়তো না। (ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্ঠা-২২ প্রকাশনা: ইদারাতুল কুরআন, করাচী]

দলিল নং ২:

حدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار

ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة

আউফ বিন মালিক (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: না, যত দিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে, আর যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, তখন তোমরা তার কাজকে ঘৃণা করবে এবং তার আনুগত্য থেকে হাত উত্তলন করবে না। (মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খেয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০)

দলিল নং ৩:

حدثنا هداب بن خالد الازدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن انكر سلم ولكن من رضى وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا (باب وجوب الإنكار على الأمراء صحيح مسلم)

উম্মে সালমা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: অচিরেই এমন কিছু শাসকদের আগমন ঘটবে, যাদের থেকে তোমরা ভালো মন্দ অনেক কিছু দেখতে পাবে। যে বুঝতে পারবে সে মুক্ত থাকবে। যে অপছন্দ করবে সে নিরাপদ হবে। কিন্তু (অপরাধ হলো তার) যে পছন্দ ও অনুসরণ করবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: না। যতক্ষণ না তারা নামায আদায় করে। (সহীহ মুসলিম)

উপরক্ত ৩ টি হাদীসের ১টি তে বলা হয়েছে ততক্ষণ লড়াই করা যাবে না যতক্ষণ না তার মাঝে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফর দেখা যায়, এর একটিতে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ কায়েম রাখে, অপরটিতে বলা হয়েছে যতক্ষণ সে নামাজ আদায় করে। হাদীস গুলোর সমন্বয় হচ্ছে এরূপ, যদি সে কুফরে বাওয়াহ করে তখন নামাজ প্রতিষ্ঠা বা আদায় করে কিনা সে দিকে লক্ষ্য করা হবে না, কেননা এ অবস্থায় নামাজ তার কোন কাজেই আসবেনা, না দুনিয়াতে আর না আখিরাতে। যদি কুফরে

বাওয়াহ না দেখা যায় তা হলে দেখতে হবে সে রাষ্ট্রীয় ভাবে নামাজ কায়েম করে কিনা, যদি কায়েম করে তাহলে দেখতে হবে সে নিজে নামাজ আদায় করে কিনা। অর্থাৎ তিনটির কোন ১ টি বিষয় যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে তাহলেই তার বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে।

এ হাদীস সমূহের আলোকে কাযী ইয়াদ (রহঃ) বলেন:

أجمع العلماء على أن الإمامة لاتنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها

সকল উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফের খেলাফতের দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায কায়েম করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। (শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, অধ্যায়-ওজূবু তআতিল উমারা, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২২৯)

এ হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام (باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع شرح مسلم النووي)

শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে। (শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২৪৪)

<u>দলিল নং 8:</u>

وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأحْمَسِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَقُولُ : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد . المعجم الكبير لطبراني

উম্মুল হুসাইন আল-আহমাসিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো যদিও একজন হাবশী গোলামকে তোমাদের প্রধান বানিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠা রাখে।(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৬৬৪৯)

<u>দলিল নং ৫:</u>

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد هو بن الحارث قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا (سنن النسائي)

ইয়াহইয়া বিন হাসীন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার দাদা থেকে শুনেছি তিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন বলেন, যদি কোনো হাবশী গোলামকে তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করে নিয়োগ দেয়া হয়, আর সে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ শুনবে ও মানবে।(সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৪১৯২)

উপরোক্ত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে শাসকের বিধান তত দিন পর্যন্ত মেনে চলতে হবে ও তার আনুগত্য করতে হবে যত দিন সে কুরআনকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসাবে বলবৎ রাখে ও কুরআন দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করে। কিন্তু শাসক যদি নিজেই কুফরের মাঝে প্রবেশ করে, কুফরী বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না, থাকতে পারে না। তাই তাকে অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া আবশ্যক হয় যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

ইজমা থেকে দলিল:

চার মাযহাবের ফকীহগণের (রহঃ) ফতওয়া:

ফিকহে হানাফী:

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর ফতওয়া:

ইমামে আজম আবূ হানীফা (রহঃ) মত হলো কোনো শাসক যদি জালেম হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাকে অপসারণ করে নতুন খলীফা নিযুক্ত করা

ওয়াজিব| যদিও বা শাসকের থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ছাড়া আরো অনেক নেককার সালাফে-সলেহীনগণ একই মত ব্যক্ত করেছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা নাতি জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন (রাদিঃ) এর ঘটনা তো সকলেরই জানা। তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়াজিদকে কাফের মনে করতেন না। তথাপি পুরা উম্মাহ হুসাইন (রাদিঃ) জিহাদকে জিহাদ বলে স্বীকার করেন, তার জিহাদ নিয়ে গর্ব করেন। জান্নাতের যুবকদের সর্দার হুসাইন (রাদিঃ) এর উপরোক্ত ‘আমালই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ।

মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

"ولا ينال عهدي الظالمين"

“যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না|” (সূরা বাকারা: ১২৪)

ইমাম জাসসাস (রাদিঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন:

"وكان مذهبه (يعني أبا حنيفة) مشهورا في قتال الظلمة , وأئمة الجور, ولذلك قال الأوزاعي: " احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف " يعني قتال الظلمة , فلم نحتمله .... وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة , وفي حمله المال إليه , وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه , وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن.

অত্যাচারী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে তার [ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)] মাযহাব প্রসিদ্ধ। এই কারণেই ইমাম আওঝা'য়ী (রহঃ) বলেন, আমরা আবূ হানীফাকে সব বিষয়ে মেনে নিয়েছি যতক্ষণ না সে তরবারি (জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ) নিয়ে আসে। আমরা তার থেকে এটা মেনে নিতে পারি না। জায়েদ বিন আলী (রহিঃ) এর সাথে তাঁর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি তাকে অর্থ প্রদান করেছেন। গোপনে মানুষকে ফতওয়া প্রদান করেছেন যে তাকে সাহায্য করা ও তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব। এমনি ভাবে আব্দুল্লাহ বিন হাসানের দুই ছেলে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম এর সাথে তাঁর বিষয়টিও জানা। (আহকামুল কুরআন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৭০)

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) যে যায়েদ বিন আলীর কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন হুসাইন (রাদিঃ) এর নাতী এবং একজন বিশিষ্ট তাবে'য়ী, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর উস্তায, তিনি তৎকালীন বনু উমাইয়ার খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আর উক্ত জিহাদে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) স্বীয় মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। মানুষদেরকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যায়েদ বিন আলী (রহঃ) কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব।

মানাকেবের মাঝে ইমাম মুওাফফাক আল-মাক্কী (রহঃ) সহীহ্ সনদে উল্লেখ করেন:

كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه , فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق , لكنت أتبعه

وأجاهد معه من خالفه , لأنه إمام حق , ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه , لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه , وقال لرسوله : ابسط عذري عنده , وبعث إليه بعشرة آلاف درهم-

যায়েদ বিন আলী (রহঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কে ডেকে পাঠালেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তার দূতকে বললেন, যদি আমি জানতাম লোকেরা তাকে অসম্মান করবেনা, তার পাশে অবিচল ভাবে দাঁড়াবে, তাহলে অবশ্যই আমি তার অনুসারী হতাম। তার সাথে মিলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতাম। কেননা তিনি একজন হক্ব ইমাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা তার পিতার ন্যায় তাকেও অসম্মান করবে। আমি তাকে আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করছি, যাতে তিনি তার বিরোধীদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করেন। অতঃপর তার দূতকে বললেন, তার নিকট গিয়ে আমার ওজর পেশ করো। আর তিনি তার নিকট দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন। (দেখুন: মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬০/২৬১)

অতঃপর মাক্কী (রহঃ) বলেন:

وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, ঐ সময় তিনি একটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাই অসুস্থতার ওজর পেশ করেছেন। ফলে তার থেকে পিছনেই থেকে যেতে হয়।

অপর বর্ণনায় এসেছে :

سئل عن الجهاد معه , فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) কে যায়েদ বিন আলী (রহঃ) এর সাথে মিলে জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তার এই জিহাদ তো বদরের দিন রসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ সদৃশ। (দেখুন: মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬০/২৬১)

উপরে ইমাম জাসসাস (রহঃ) যে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করেছেন তারা হাসান (রাদিঃ) এর নাতী আব্দুল্লাহ (রহঃ) এর সন্তান ছিলেন। তারা দুই ভাই তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছন। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য ফতওয়া প্রদান করতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করেননি। তার ক্ষেত্রে যদি ইমাম আজমের অবস্থা এই হয়, তাহলে বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে কী হতে পারে?

মুওাফফাক আল-মাক্কী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব মানাকেবে লিখেন:

أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم و يأمرهم بإتباعه , وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) জনসাধারণকে ইব্রাহীম (রহঃ) এর পক্ষ উদ্বুদ্ধ করতেন। তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তার সাথে মিলে যুদ্ধ করাকে পঞ্চাশটি হজ্জের উপর প্রাধান্য দিতেন। (দেখুন: মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৮৪)

ইমাম কারদারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ "মানাকেবে" বর্ণনা করেন:

أن الإمام أباحنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبدالله , ويقال: إن المنصور سم أباحنيفة من أجل هذا , حتى توفى رحمه الله-

খলীফা মানসূরের একজন সেনাপতি ছিলেন হাসান বিন কাহতাবা। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) তাকে ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নিষেধ করে ছিলেন। বলা হয় খলীফা মানসূর একারণেই আবূ হানীফা (রহঃ) কে বিষ পান করান। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আমীন.(দেখুন: মানাকেবে ইমাম আবী হানিফা লিল কুরদী, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২২)

নির্দেশনা:

এই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। পঞ্চাশটি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মাল দ্বারা সে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের কোন অকাট্য বিধানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তারা বর্তমানের শাসকদের ন্যায় এত চরম জঘন্য ছিলেন না। তাদের ব্যাপারে জান্নাতী যুবকদের সর্দার হুসাইন (রাদিঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর অবস্থান যদি এই হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে?

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.

দাউদী (রঃ) বলেছেন: আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি সামর্থ্য থাকে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করার তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্য ধরা ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদয়াতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে এবং পরে বিদয়াত ও জুলুম করে তবে

তার অপসারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা। যতক্ষণ না সে কুফরী করে। যদি সে কুফরী করে, তাহলে তাকে অপসারণ করতে দাঁড়ানো ওয়াজিব হয়ে যায়। (উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০)

৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..(مرقاة المفاتيح : 11 / 303)،

উলামাগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফের শাসনভার পেতে পারে না। যদি শাসক হবার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তবে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কায়েম, নামাযের দিকে আহবান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদ'আত করে। (মেরকাত,খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৩০৩)

৪. হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

শায়েখ ত্বকী উসমানী (দাঃ বাঃ) তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহিমে مسئلة الخروج علي أئمة الجور "জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ" - নামক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

তাতে তিনি প্রসিদ্ধ ফকীহ হাকিমুল উম্মাত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর বরাত দিয়ে অবস্থাভেদে শাসকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। তিনি শাসকদের তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাপারে উল্লেখ করেন:

والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفر , سواء كان كفر تكذيب وجحود , أو كفر عناد ومخالفة , أو كفراستخفاف أو استقباح لأمور الدين . وفي هذه الصورة ينعزل الإمام , وينحل عقد الإمامة , فإن أصر على بقائه إماما , وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة ولكن يشترط في ذلك أن يكون الكفر متفقا عليه

শাসকদের তৃতীয় শ্রেণী হলো ঐ শাসক যার উপর কুফর আপতিত হয়েছে। চাই তা কুফরে তাকজীব হোক (কোনো হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করা)। কুফরে জুহূদ হোক (আন্তরিক ভাবে আল্লাহর বিধান জানা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে ও কর্মগত ভাবে তা অস্বীকার করা)। কুফরে 'ইনাদ হোক (সত্যকে জানা ও সত্য বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও দম্ভ করে তার সামনে আত্মসমর্পণে অস্বীকার করা। যেমন: আবূ তালেবের কুফরী), বা কুফরে মুখালাফাহ হোক (আল্লাহর কোনো বিধানকে তার বিধান হিসাবে জানা সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করা। যেমন: মিরাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান জানা সত্ত্বেও এর বিরোধিতা করা। এই বিধান পরিবর্তনের আবেদন তোলা)। চাই কুফরে এস্তেখফাফ হোক বা ইস্তেহজা হোক (আল্লাহর কোন বিধানকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা সেটাকে ভালো মনে না করা। যেমন: তাচ্ছিল্য করে জিহাদকে জঙ্গিবাদ বলা। হুদুদ, কিসাসকে মধ্যযুগীয় আইন বলে আখ্যায়িত করা)। দ্বীনী বিষয় সমূহের সাথে যে কোনো ধরনের কুফরীই হোক না কেন। এক্ষেত্রে শাসক অপসারিত হবে। শাসনের দায়িত্বভার তার থেকে চলে যাবে। তথাপি সে যদি শাসক হিসাবে থাকতে জোর জবরদস্তি করে, তবে মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে তাকে অপসারিত করা। তবে শর্ত হলো সক্ষমতা থাকা এবং কুফরটি মুত্তাফাক আলাইহ্ হওয়া (অর্থাৎ যাকে সকল

ইমাম কুফর মনে করতেন)। [দেখুন: তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১]

নির্দেশনা:

আমরা বর্তমান শাসকদের মাঝে উপরোক্ত অনেকগুলো কুফর দৈনন্দিন পূর্ণ স্পষ্ট রূপে দেখতে পাই। ব্যাপকভাবে সকলের মাঝে। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই বর্তমান আমাদের দেশগুলোর শাসকরা এই তৃতীয় শ্রেণীর শাসকদেরই অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শাসকদের সপ্তম প্রকারের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, যে শাসক ধারাবাহিক ভাবে শর'য়ী আইন পরিবর্তন করে, সে যে কারণেই তা করুক, সামর্থ্য থাকার শর্তে তার বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হবে। তাই বর্তমান শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা বাঞ্চনীয় নয়।

৫.আল্লামা ত্বকী উসমানী (দাঃ বাঃ) এর ফতওয়া:

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب – والله أعلم – أن فسق الإمام على قسمين:

الأول ما كان مقتصرا على نفسه , فهذا لا يبيح الخروج عليه , وعليه يحمل قول من قال : إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه .

والثاني: ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر , و إقامة شعائره , وتحكيم قوانينه , واستخفاف أحكام الدين , والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه , وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح . ويجوز حينئذ الخروج بشروطه.

"শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ" এ প্রসঙ্গে শরয়ী নুসূস সমূহ এবং মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহাগণের উক্তি সমূহ অধ্যায়নের পর এই দুর্বল বান্দার নিকট [আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন] যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে [আর আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন] শাসকের পাপাচারসমূহ দু'ধরনের:

এক. যা শাসকের নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের অপরাধ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ করেনা। আর যারা বলেছেন ফাসিক অথবা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয় তাদের মত এক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হবে।

দুই. যা অন্যের মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করবে। আর তা হলো, কুফরের প্রকাশ স্থলগুলোর অনুমতি প্রদান করা, কুফরের শে'আরগুলো প্রতিষ্ঠা করা, কুফরী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনী বিধি-বিধান সমূহকে গুরত্বহীন মনে করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকা, তাকে অপছন্দ করার কারণে আল্লাহর শরীয়ার উপর অন্য কোনো শরীয়াকে প্রাধান্য দেয়া। আর এ সবগুলোই কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ হবে।[দেখুন: তাকমীলায়ে ফাতহুল মুলহীম, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৬-৩৩১]

ফিকহে শাফিঈ:

১. কাযী ইয়ায (রহঃ) এর ফতওয়া:

أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلوطرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ– تحفة المحتاج)

সকল উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফের খেলাফতের দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। তিনি আরও বলেন, জমহুরের মতে শাসক যদি বিদ‘আত করে (তবে তাদের হুকুম একই)। কতিপয় বসরী আলেমের মত হলো, বিদ‘আতির জন্য শাসনভার থাকবে এবং সেটা সার্বক্ষণিক হবে, কেননা সে তাবিলকারী। কাজী ইয়ায (রহঃ) আরও বলেন: শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরী‘য়ার কোনো বিধান পরিবর্তন করে অথবা বিদ‘আত

করে তবে তার থেকে শাসন ভার চলে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, এবং তাকে অপসারণ করা আর একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নির্ধারণ করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি এটি করতে গিয়ে একটি বড় দলের প্রয়োজন হয়, তবে তাদের উপর ওয়াজিব হবে এই কাফেরকে অপসারণের জন্য উঠে দাঁড়ানো। (তুহফাতুল মুহতাজ, খন্ড:৩৮, পৃষ্ঠা:১৮৫,শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, অধ্যায়-ওজূবু তআতিল উমারা, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২২৯)

২. ইমাম নববী (রহঃ) এর ফতওয়া:

لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام (باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع شرح مسلم لنووي)

শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে। (শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২৪৪)

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয় যতক্ষণ না শাসক কোনো একটি মৌলিক বিধান পরিবর্তন করে। আমাদের শাসকেরা কত শত বিধানকে পরিবর্তন করেছে!

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) এর ফতওয়া:

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ....فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير[تفسير ابن كثير]

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর দৃঢ় বিধানকে ছেড়ে দেয়। অথচ তা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে নিষেধ করে। কুরআন-সুন্নাহ্ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়ার সাথে যার নেই কোনো সম্পর্ক। .... যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে এবং কম হোক বেশী হোক কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ১৩১]

৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

ইবনে হাজার (রহঃ) এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল, ইবনে তীন, দাউদী (রহঃ) সহ অন্যান্যদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন:

وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

মোট কথা : তাকে তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হলো তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে অবহেলা করবে সে হবে গুনাহগার। আর যে অক্ষম হবে তার উপর ওয়াজিব হলো ঐ এলাকা থেকে হিজরত করা। (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩)

৫. আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহঃ) এর ফতওয়া:

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال

গ্রহণযোগ্য সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, কাফেরের জন্য কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমানের উপর কর্তৃত্ব নেই। [আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খন্ড:২, পৃষ্ঠা: ৪১৪]

ফিকহে মালিকী :

১. ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহঃ) এর ফতওয়া:

ইবনে বাত্তাল (রহঃ) বলেন :

في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار . وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء , وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده , و لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح , فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.

এই হাদীসই প্রমাণ বহন করে, শাসক যদি জুলুম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন, বিজয়ী শাসকের আনুগত্য ও তার সাথে মিলে জিহাদ ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই উত্তম। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায়। আর তাদের দলিল হলো, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস। তবে তারা এ থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হলো যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয় বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। [ফাতহুল বারী, খন্ড:১৩, পৃষ্ঠা: ৭]

২. আল্লামা কুরতূবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة/30]

[هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة

إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه]

এই আয়াতটিই মূল ভিত্তি যে, এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করতে হবে যার আদেশ শুনা হবে৷ আনুগত্য করা হবে৷ যাতে তার দ্বারা কালিমা সমুন্নত হয়৷ খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়৷ এ ব্যাপারে উম্মাহ্ ও আইম্মাহ্দের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই৷ হ্যাঁ তবে শরীয়ার ব্যাপারে বধির ব্যক্তি যদি কোনো মত প্রকাশ করে আর কেউ তার মত ও মাযহাবের অনুসরণ করে তার কথা ভিন্ন৷ একই ভাবে যে ব্যক্তি তারই সুরে কথা বলে৷ তার মত ও মাযহাব অনুসরণ করে তার কথা ভিন্ন৷ [তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬৪]

৩. কাযী ইবনুল আরাবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

"إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع" أحكام القرآن" (641/1)

নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা শরী'য়ার মধ্যে কাফেরদেরকে মুমিনদের উপর কোনোই কর্তৃত্ব প্রদান করেননি৷ যদি তা বিদ্যমান থাকে তাহলে তা হবে শরী'য়ার বিপরীত৷ (আহকামুল কুরআন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৪১)

৪. ফকীহ ইবনুত তীন (রহঃ) এর ফতওয়া:

أجمَعوا على أن الخليفةَ إذا دعا إلى كفرٍ أو بدعةٍ، يُقام عليه"

ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন, খলীফা যখন কোনো কুফর বা বিদ‘আতের দিকে আহবান করবে তখন নিশ্চিতভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আবশ্যক হবে। (ইরশাদুস সারী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:২১৭)

৫.আল্লামা শানকিতী (রহঃ) এর ফতওয়া:

من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللّٰه في أرضه . و لم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي ،

দীনের স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ একটি আবশ্যকীয় বিধান হচ্ছে, মুসলমানদের উপর এমন একজন ইমামকে নিয়োগ করা ওয়াজিব যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে তার বিধান বাস্তবায়িত হবে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু এমন ব্যক্তিই দ্বিমত পোষণ করেছে যারা গণনার মধ্যে পড়ে না। যেমন: আবু বাকর আসাম আল-মু‘তাযিলা। (তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২২)

<u>ফিকহে হাম্বলী:</u>

১. ইমাম ইবনে কুদামা (রহঃ) এর ফতওয়া:

"أما الكافر، فلا ولايةَ له على مسلمةٍ بحالٍ، بإجماع أهل العلم؛ منهم: مالك، والشافعي، وأبوعبيد، وأصحاب الرأي"؛

কাফেরের জন্য কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের উপর কোনো ধরনের কর্তৃত্ব নেই। এটি আলেমগণের ঐকমত্যে সাব্যস্ত। তাঁদের মধ্য থেকে হলেন মালেক, শাফীঈ, আবূ উবাইদ এবং আসহাবুর রায়গণ (রহঃ)। (আল-মুগনী, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:৩৬৩)

২. কাযী আবূ ই'য়ালা (রহঃ) এর ফতওয়া:

إن حدث منه ما يقدح في دينه نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقدخرج عن الإمامة وهذا لاإشكال فيه لأنه خرج عن الملة و وجب قتله -

যদি শাসকদের থেকে এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়, যা দ্বীনের মধ্যে নিন্দনীয় বিষয় তাহলে লক্ষ্য করা হবে, সে যদি ঈমান আনার পর কুফরী কাজ করে তাহলে শাসনভার তার থেকে চলে যাবে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কেননা সে উম্মাহ থেকে বের হয়ে গেছে। আর তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হবে। (আল-মুতামাদ ফী-উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৪৩)

৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর ফতওয়া:

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات ، أو الصيام ، أو الحج ، أو عن التزام تحريم الدماء ، والأموال ، والخمر ، والزنا ، والميسر ، أو عن نكاح

ذوات المحارم ، أو عن التزام جهاد الكفار ، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب ، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء "

মুসলিমদের কোনো দল যদি কিছু ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় অথবা রোযা, হজ্জ থেকে বিরত থাকে, বা জুয়া, সুদ, জিনা, অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণকে হারাম না করে, গাইরে মাহরামকে বিবাহ করে বা জিহাদকে আঁকড়ে না ধরে, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্য না করে অথবা এ ধরনের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, অথবা এমন কোনো হারাম থেকে বিরত না থাকে যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, এই নিবৃত দলটির বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে৷ যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে৷ আর এ ব্যাপারে আমার জানা মতে উলামাদের মাঝে কোনো ধরনের দ্বিমত নেই৷ (মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ২৮/৫০২)

তিনি আরো বলেন :

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا ...

وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة

মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামদের মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় না করে তাহলে নামাজ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে তাহলে যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করতে হবে। একই হুকুম রমজানের রোজা ও হজ্জ্ব আদায় না করলেও প্রযোজ্য। একই ভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও প্রযোজ্য।(মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০)

<u>উম্মাহর অন্যান্য ফুকাহাগণের মতামত</u>

১. দামেশ্কী (রহঃ) এর ফতওয়া:

اتَّفق الأئمةُ على أن الإمامةَ فرضٌ...، وأن الإمامةَ لا تَجُوز لامرأةٍ ولا لكافر

ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন শাসক নির্ধারণ ফরজ..., আর কোনো মহিলা বা কাফেরের জন্য শাসন ভার বৈধ নয়।(রহমাতুল উম্মাহ, পৃষ্ঠা:২৮৩)

২. আল্লামা শাওকানী (রহঃ) এর ফতওয়া:

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء و لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها".

ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন, বিজয়ী শাসকের সাথে মিলে জিহাদ করা ও তার আনুগত্য করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে উত্তম। কেননা এতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং........। হ্যাঁ তবে তারা এক ক্ষেত্রে এসে ভিন্ন হুকুম বর্ণনা করেছেন আর তা হলো, যদি শাসকের থেকে স্পষ্ট কোনো কুফর প্রকাশ পায় তাহলে আর তার আনুগত্য করা যাবে না, সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (নাইলুল আওতার, খন্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৯৮)

৩. মুহাম্মাদ রশীদ রেজা (রহঃ) এর ফতওয়া:

"ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقاداً أنه لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق "وإنما الطاعة في المعروف" وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا

ارتد عن الإسلام واجب وأن إباحه المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود، وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة".

বিশ্বাস ও উক্তি উভয়দিক থেকে সর্ব সম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত মাসআলাগুলোর মধ্য থেকে হলো, স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধুমাত্র ভালো কাজের ক্ষেত্রে| আর মুসলিম শাসক যখন ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় তখন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ওয়াজিব। সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত কোনো হারামকে বৈধতা প্রদান যেমন: জেনা, মদ, আল্লাহতা'আলার হুদুদ পরিবর্তনের বৈধতা প্রদান, আল্লাহতা'আলা যার অনুমতি দেননি এমন ধরনের আইন প্রণয়ন, এগুলো হচ্ছে কুফর ও রিদ্দাহ। (তাফসীরুল মানার, খন্ড:৬, পৃষ্ঠা:৩৬৭)

জাহেরী ফুকাহাগণের ফতওয়া

আল্লামা ইবনে হাযাম (রহঃ) এর ফতওয়া:

واتَّفَقُوا أن الإمامة لا تَجُوز لامرأةٍ، ولا لكافرٍ، ولا لصِبيٍّ لم يَبلُغ، وأنه لا يجوز أن يُعْقَد لَمجنون"

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন, মহিলা, কাফের, বালেগ হয়নি এমন শিশুর জন্য শাসনের দায়িত্বভার বৈধ নয়। এমনিভাবে পাগলকেও এর দায়িত্ব দেয়া বৈধ নয়। (মারাতেবুল ইজমা,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:১২৬)

নজদী আলেম গণের ফতওয়া

১. শায়েখ হামাদ বিন আতীক নাজদী (রহঃ) এর ফতওয়া:

(قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} وقلت: ومثل هؤلاء ماوقع فيه عامة البواد او من شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها "شرح الرفاقة" يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله و رسوله-

মহান আল্লাহতা'আলা বলেন: "তারা কি তাহলে জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে?" আমি বলি, আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের অবস্থার মতোই হলো বর্তমান অধিকাংশ বেদুঈন ও তাদের সদৃশ অন্যান্যদের অবস্থা। অর্থাৎ যারা বিচার ফায়সালা করে তাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি অনুযায়ী এবং তাদের পূর্ব পুরুষ কর্তৃক বানোয়াট অভিশপ্ত একটি সংবিধান অনুযায়ী। যার নাম তারা রেখেছে 'আর-রিফাক্বহ'। তারা সেটিকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহের উপর প্রাধান্য দেয়। আর যে ব্যক্তিই এধরনের কাজ করবে নিশ্চিতভাবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর তার বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না সে আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের দিকে ফিরে আসে। (মাজমুয়াতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা:৩০৬)

২. শায়েখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) এর ফতওয়া:

إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه: أن الكفر أكبر من القتل، قال: **{والفتنة أكبر من القتل}**، وقال: **{والفتنة أشد من القتل}** والفتنة: هي الكفر ؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً

... আপনি (পূর্বের আলোচনা থেকে) বুঝতে পেরেছেন তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা কুফর। আর আল্লাহতা'আলা তার কিতাবের মাঝে বলেছেন কুফর হত্যার চেয়ে গুরুতর। তিনি বলেন: আর ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৭)। তিনি আরো বলেন: আর ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯১)। আর এখানে ফেতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুফর। সুতরাং যাযাবর ও সভ্য নাগরিকরা পরস্পর যদি লড়াই করে এমনকি সকলেই যদি নি:শেষ পর্যন্ত হয়ে যায় সেটাও জমিনে একজন তাগুতকে শাসনভার দেয়ার চেয়ে নগণ্য। (দেখুনঃ http://www.tawhed.ws/FAQ/pr?qid=5176&PHPSESSID=768dbd7b5ece547e5d7e1e40e776fe00)

সমকালীন আরব আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ আব্দুল্লাহ দুমাইজী (রহঃ) এর ফতওয়া:

أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي هو الردة والكفر بعد الإيمان, فإذا ما ارتكب الإمام جرماً عظيماً يؤدي إلى الكفر و الإرتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك ولا يكون له ولاية على مسلم بحال.

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুতর যে কারণটি শাসকের অপসারণকে আবশ্যক করে তা হচ্ছে ঈমান আনার পর কুফর ও রিদ্দাহকে গ্রহণ করা। যখন শাসক এমন কোনো জঘন্য অপরাধ করবে যা কুফর পর্যন্ত পৌছায়, দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়। এর দ্বারা সে পদচ্যুত হয়ে যাবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো মুসলমানের উপরেই তার কর্তৃত্ব বাকি থাকবে না।(আল-ইমামাতুল উজমা, অধ্যায়-আযলুল ইমাম, পৃষ্ঠা:৪৬৫)

২. উস্তায আব্দুল কাদের আউদাহ্ (রহঃ) এর ফতওয়া:

وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر و ردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذاارتد واجب على المسلمين وأقل درجات الخروج على أولي الأمرهوعصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة. (الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه)

সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম বলে সাব্যস্ত কোনো জিনিসকে বৈধতা দেয়া, যেমন: জেনা, মদ অথবা হুদুদ সহ অন্যান্য শর‘য়ী বিধানাবলীকে বাতিল করা অথবা আল্লাহ অনুমতি দেননি এমন বিধান রচনা করা, কুফর ও রিদ্দাহ। আর যখন মুসলমানদের শাসক মুরতাদ হয়ে যায় তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব। আর শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সর্ব নিম্নস্তর হলো, শরী‘য়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাদের এমন আদেশ নিষেধগুলোর অবাধ্যতা করা। (আল-ইসলাম বাইনা জাহলি আবনাইহ ও আঝযি উলামাইহ)

৩. ড. সলাহ দাবূস এর ফতওয়া:

وكذلك استبعاد ولي الأمر، أوالخليفة، الإسلام من توطين الحياة العامة والخاصة للجماعة وكل صورة تشابهها ويمكن أن ينتهي منها المسلم العادل إلى الحكم بكفر الخليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بطاعة ولاة أمورهم ما لم يروا منهم كفراً بواحا لقوله في حديث عبادة بن الصامت "

إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)، ولاتثار هنا فكرة الفتنة إذ لافتنة أكبر من ظهور كفر الخليفة أو ولي الأمر أو استبعاد الإسلام من حياة الجماعة"

অনূরূপভাবে খলীফা বা শাসক যদি জনগণের বিশেষ ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখে, অথবা এ ধরনের অন্য কোনো কাজ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়বান মুসলমান খলীফাকে তাকফীর করতে পারে। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে ততক্ষণ শাসকদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কুফর দেখতে পায়। যেমনটি রয়েছে উবাদা বিন সামেত (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে: "হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা কোনো স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।" (সহীহ মুসলিম) আর এ ক্ষেত্রে ফেতনার চিন্তা-ভাবনা উঠানো যাবে না কেননা শাসক বা খলীফার থেকে কুফর প্রকাশ অথবা সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেয়ে বড় ফেতনা কিছুই হতে পারে না। [আল-খলীফা তাওলিয়াতুহু ও আযলুহু, অধ্যায়: আহকামু আযলিল খলীফা, পৃষ্ঠা:৩৭৩]

মুজাহিদীন আলেমগণের ফতওয়া

১. শায়েখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন (রহঃ) এর ফতওয়া:

وقد اجمع علماء الاسلام على ان الولاية لا تنعقد لكافر، فاذا طرأ عليه الكفر سقطت ولايته فوجب القيام عليه بالسلاح،

উলামায়ে ইসলাম একমত পোষণ করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার কাফেরের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। যদি শাসকের উপর কুফর আপতিত হয়, তবে তার দায়িত্বভার চলে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ওয়াজিব হবে।

অতঃপর এ সংক্রান্ত দলিল উল্লেখ করে শায়েখ বলেন:

اذن فالقول بالخروج على الامام الكافر ليس قولنا، وانما هو قول اجماع الائمة، وهذا هو حكم الشرع في مثل حالنا.(النــــــزاع بين حكام آل سعود والمسلمين والسبيل إلى حله)-12

সুতরাং কাফের শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ - এটা আমাদের কথা নয়, বরং তা আয়িম্মায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি মত। আর আমাদের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান এটাই। (আন নেঝাউ বাইনা হুক্কামে আলে সাউদ ওয়াল মুসলিমীন, পৃষ্ঠা:১২)

২. শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী (দা:বা:) এর ফতওয়া:

«بل في حساب الإسلام وأصول شريعته يُقدّم قتال هؤلاء الحكام المرتدين على غيرهم من الكفار الأصليين لثلاثة أسباب، الأول: أنه قتال دفع متعيّن وهو مقدّم على قتال الطلب لأن هؤلاء الحكام المرتدين عدوٌّ تسلط على بلاد المسلمين... الثاني: أن المرتد أغلظ جرماً من الكافر الأصلي... الثالث :لأنهم العدو الأقرب...». (كتاب شفاء صدور المؤمنين)

ইসলামের মাপকাঠি ও তার শরীয়তের মুলনীতি অনুযায়ী, অন্যান্য আসলী কাফেরদের চেয়ে এ সমস্ত মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে কিতাল তিন কারণে আগ্রাধিকার পাবে: এক. এটি প্রতিরোধমূলক ফরজে আইন কিতাল। সুতরাং তা ইকদামী জিহাদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। কেননা এ সমস্ত মুরতাদ শাসকেরা আমাদের সেই শত্রু যারা মুসলিম দেশগুলোর উপর চেপে বসেছে।.... দুই. মুরতাদরা আসলী কাফেরদের চেয়ে ঘোরতর অপরাধী।.... তিন. কেননা তারা নিকটবর্তী শত্রু|... [শেফাউ সুদূরিল মুমিনীন,পৃষ্ঠা:১০/১১]

৩. শায়েখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবী (রহঃ) এর ফতওয়া:

اتفق العلماء قاطبةً على أن الولاية لا تنعقد لكافرٍ، وأنه لو طرأ على الإمام كفرٌ انعزل به ووجب الخروج عليه وخلعه عند الاستطاعة.

সকল আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, শাসনের দায়িত্বভার কোনো কাফেরের জন্য হতে পারে না। আর যদি কোনো শাসকের উপর কুফর আপতিত হয়, তবে সে অপসারিত হবে। আর সক্ষমতা থাকলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ও তাকে অপসারণ করা আবশ্যক হবে। [আল-জিহাদ ও মা‘আরেকাতুশ শুবহাত, পৃষ্ঠা:২৩]

কেয়াস থেকে দলিল

এক. **সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কেয়াস**

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা

আবু বকর সিদ্দীক (রাদিঃ) এর সীরাতের উপর দৃষ্টি দিন। যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তার আচরণ কিরূপ ছিল। যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল, বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তা পালন করছিল। তারা আল্লাহতা'আলার বিধানসমূহ থেকে শুধু একটি বিধান আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর তারা এটি করেছিল একটি দলিল, একটি সংশয়ের উপর ভিত্তি করে। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে দলিল পেশ করছিল। তথাপি আবু বকর (রাদিঃ) তাদেরকে নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেননি, বলেননি যে, আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে এক দিন তারা ইসলামী বিধানের দিকে ফিরে আসে। বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করেছিলেন, তাদের গর্দানে আঘাত করেছিলেন। তাদের উপর আক্রমণ করেছিলেন, তাদেরকে হত্যা করেছিলেন, তাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে বন্দী করেছিলেন, যতক্ষণ না তারা পূর্ণরূপে ইসলামকে মেনে নেয়, আল্লাহতা'আলার সকল বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে।

فعن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله] قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه

আবু হোরায়রা (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবু বকর (রাদিঃ) খেলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করলেন, এ সময় আরবের অনেক ব্যক্তি কুফরী করলো৷ তখন উমর (রাদিঃ) বললেন, হে আবু বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল করবেন? অথচ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)| আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও জানকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে তবে তার হক্কের কারণে আর তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যস্ত| আবু বকর (রাদিঃ) বললেন: আল্লাহর শপথ

অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো মালের হক্ব। আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা তারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো তাহলে এই বিরত থাকার কারণে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। উমর (রাদিঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে যে,আল্লাহতা'আলা কিতালের ব্যাপারে আবু বকর (রাদিঃ) এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এটাই হক্ব। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৫২৬)

ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেন:

وفيه وجوب قتال ما نعی الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه لو منعونی عقالا أو عناقا

এতে এ প্রমাণ বিদ্যমান আছে যে, যারা যাকাত, নামায অথবা অন্য কোনো ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে - চাই কম হোক কিংবা বেশী, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। কেননা আবু বকর (রাদিঃ) বলেছেনঃ যদি তারা আমাকে একটা রশি (অপর রেওয়াতে এসেছে) যদি একটা উটের বাচ্চা পর্যন্ত দেয়া থেকে বিরত থাকে (তথাপি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো)। (শরহে মুসলিম লিন নববী,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২১২)

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। (সূরা তাওবা, আয়াত:১০৩)

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন:

ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصًا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} وقد رَدَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة، كما كانوا يُؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عِقالا -وفي رواية: عَناقًا -يُؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه.]

আর একারণে আরব কবীলাগুলোর মধ্য থেকে যাকাত প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারী কিছু ব্যক্তির অভিমত ছিল “খলীফাকে যাকাত প্রদান করতে হবে না। বরং এটি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর জন্য খাস ছিল|” আর এর স্বপক্ষে তারা আল্লাহতা‘আলার বাণী দিয়ে দলিল পেশ করেছিল: আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।

আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহ আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। আবু বকর (রাদিঃ) ও সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের এই ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত চিন্তা-ধারা খন্ডন করেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন যতক্ষণ না তারা খলীফাকে যাকাত প্রদান করে যেমন তারা রসূলসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামকে প্রদান করতো। এমনকি আবূ বাকর (রাদিঃ) ঘোষণা প্রদান করেন: যদি তারা আমাকে লাগামটি পর্যন্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে (পর রেওয়াতে এসেছে একটি ছাগল ছানা) যা তারা রসূলসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো, সেটি প্রদানে বিরত থাকার কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:২৭০)

<u>কেয়াস:</u> সাহাবায়ে কেরাম ইজমার ভিত্তিতে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিতাল করেছিলেন যারা ইসলামের সকল বিধান মেনে নিয়েছিল, সকল বিধান পালন করছিল শুধুমাত্র একটি বিধান তথা যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং, এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি কিতাল করা ওয়াজিব হয় তাহলে যারা ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করবে, ইসলামী বিধি-বিধান শুধু নিজেরাই আদায় করা থেকে বিরত থাকবে এমনটি নয় বরং এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সেগুলোকে অকার্যকর করে রাখবে, মুসলমানদেরকে আল্লাহর বিধানে আদায়ে বাধা প্রদান করবে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর যে ওয়াজিব সে ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

দুই. ফুকাহাগণের ইজমা থেকে কেয়াস।

ফুকাহাগণের ইজমা

মুসলিমদের কোনো দল, ইসলামের অকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর কোনো একটি যদি প্রকাশ্যভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন।

সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত:

মহান আল্লাহতা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة/278- 279]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার করবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৮-২৭৯)

আল্লামা খাযেন (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

[قال أهل المعاني : حرب الله النار وحرب رسوله السيف واختلفوا في معنى هذه المحاربة فقيل المراد بها المبالغة في الوعيد والتهديد دون نفس الحرب ، وقيل : بل المراد منه نفس الحرب وذلك أن من أصر على أكل الربا وعلم به الإمام قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة، وإن كان آكل الربا ذا شوكة وصاحب عسكر حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية، قال ابن عباس : من كان مقيماً على أكل الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع أي تاب وإلاّ ضرب عنقه]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহর যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নাম আর রসূলের সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তরবারি। তারা এ যুদ্ধের অর্থের ব্যপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, বলা হয়েছে এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়নি, বরং চরমভাবে ধমক দেয়া হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে। এটিও বলা হয় যে, এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াইকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর সেটি ঐ ক্ষেত্রে, যদি কেউ সুদ খেতে থাকে আর ইমাম তার ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে তাকে গ্রেফতার করবে অতঃপর সে তওবা করার আগ পর্যন্ত তার উপর আল্লাহতা‘আলার বিধান জারি করবে অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করবে, আটকে রাখবে। আর যদি সুদ গ্রহণকারী শক্তিধর হয় ও সামরিক শক্তির অধিকারী হয়। তাহলে ইমাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যেমনটি করে থাকে বাগীদের বিরুদ্ধে। ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) বলেন: যে ব্যক্তি সুদ খেতে অভ্যস্ত, তা থেকে বিরত থাকে না, মুসলিম ইমামের দায়িত্ব হলো তাকে তওবা করার আদেশ

দেবে যাতে সে বিরত থাকে অর্থাৎ তওবা করে৷ আর যদি বিরত না থাকে তাহলে দেহ থেকে তার মস্তক দ্বি-খন্ডিত করে দেবে৷ (তাফসীরে খাজেন,খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩১৬)

ইমাম কুরতূবী (রহঃ) বলেন:

وقال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: " فأذنوا بحرب من الله ورسوله".

ইবনে খুওয়াইজ (রহঃ) বলেন, কোনো শহরের মানুষ যদি সুদকে হালাল হিসাবে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে তারা মুরতাদ হয়ে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে৷ আর যদি তারা হালাল হিসাবে এমনটি না করে তথাপি ইমামের জন্য বৈধ হলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা৷ তুমি কি লক্ষ্য করোনা আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন৷ তিনি বলেছেন, আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো৷ (সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৮-২৭৯) (তাফসীরে কুরতুবী,খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৬৪)

আল্লামা জাসসাস এর উপর আল্লাহতা'আলা রহমত বর্ষণ করুন৷ তিনি পূর্ণ স্পষ্ট রূপে আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন৷ তিনি বলেন:

{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} إخبار منه بعظم معصيته وأنه يستحق بها المحاربة عليها وإن لم يكن كافرا وكان ممتنعا على الإمام، فإن لم يكن ممتنعا عاقبه الإمام بمقدار ما يستحقه من التعزير والردع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم سائر المعاصي التي أوعد الله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها، وإن كان ممتنعا حورب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حتى ينتهوا، وإن كانوا غير ممتنعين عاقبهم الإمام بمقدار ما يرى من العقوبة.

আল্লাহতা'আলার বাণী: আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করো। (সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৯) আল্লাহতা'আলা তার অপরাধের গুরুতরতা সম্পর্কে অবগত করছেন, ইমামের দায়িত্ব হল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা যদিও সে কাফের না হয় কিন্তু আল্লাহ তালার বিধান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আর যদি বিরত না থাকে তাহলে ইমাম তাকে তার অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী সাজা প্রদান করবে। একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এমন সকল পাপের ক্ষেত্রেই যার ব্যাপারে আল্লাহতা'আলা শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন, যদি লোকেরা সেগুলো অব্যাহত ও প্রকাশ্য ভাবে করতে থাকে। আর যদি সে বিধানটি মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। তারা বিরত হবার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা হবে। আর যদি বিধানটি মেনে নিতে অসম্মতি না জানায় তাহলে ইমাম যতটুকু ভালো মনে করে তাকে শাস্তি প্রদান করবে।

তিনি আরো বলেন:

فالمقيم على أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر، وإن كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة، وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبوا

সুদ গ্রহণকারী যদি সেটিকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের, আর যদি সে একটি গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত কাজ সম্পূর্ণ করে তাহলে ইমাম তাদের সাথে সে আচরণই করবেন যা করা হয় মুরতাদদের ক্ষেত্রে যদিও তারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তই ছিল। যদি তারা মুখে তা হারাম বলে স্বীকার করে এবং হালাল মনে না করেই তা সম্পাদন করে, তা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে, তাহলে ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। (আহকামুল কোরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:১৯২)

কর গ্রহণকারী শাসকদের ব্যাপারে জাস্‌সাস (রহঃ) এর অভিমত:

যে সমস্ত জালিম শাসক মুসলমানদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের প্রতি প্রযোজ্য হুকুম বর্ণনা করে আল্লামা জাস্‌সাস (রহঃ) বলেন:

وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة وآخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعين، وهؤلاء أعظم جرما من آكلي الربا لانتهاكهم حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعا، وآكل الربا إنما

انتهك حرمة الله تعالى في أخذ الربا و لم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة; لأنه أعطاه بطيبة نفسه، وآخذو الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتهكين لحرمة نهي الله تعالى وحرمة المسلمين; إذ كانوا يأخذونه جبرا وقهرا لا على تأويل ولا شبهة، فجائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم، وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال...

একইভাবে অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অধিকারী যে সমস্ত জালিমরা মানুষদের সম্পদ দখল করে, তাদের থেকে কর গ্রহণ করে, তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তারা আল্লাহর বিধান মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে হত্যা করা। এরা সুদ গ্রহণকারীদের চেয়েও জঘন্য অপরাধী। কেননা এরা আল্লাহতা'আলা যে নিষিদ্ধ বিধান দিয়েছেন তার সম্মান নষ্ট করেছে এবং মুসলমানদের সম্মান নষ্ট করেছে। আর সুদ গ্রহণকারী সুদ গ্রহণ করে আল্লাহর আদেশের অসম্মান করেছে, তবে যার থেকে সে গ্রহণ করেছে তার সম্মান নষ্ট করেনি, কেননা সেতো তা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করেছে। কর গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে ডাকাতদের ন্যায়, আল্লাহতা'আলার বিধান ও মুসলমানদের সম্মান নষ্টকরী। যদি সংশয় বা ব্যাখ্যা দিয়ে নয় বরং অন্যায়ভাবে শক্তি খাটিয়ে তা গ্রহণ করে তাহলে যে মুসলমানই জানতে পারবে যে তারা অন্যায়ভাবে অনবরত মানুষের সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করছে তার জন্যই জায়েয হবে, যে ভাবেই হত্যা করা সম্ভব তাকে

হত্যা করে ফেলা। একই ভাবে তার অনুসারী ও যাদের মাধ্যমে তারা সম্পদ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদেরকেও।(আহকামুল কোরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:১৯২)

নামাজ রোযাসহ অন্যান্য ওয়াজিবাত পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত:

মহান আল্লাহতা'আলা বলেন:

وقال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة/5]،

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাকো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা, আয়াত:৫)

আল্লাহতা'আলা উক্ত আয়াতে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা যাতে মুশরিকদেরকে যেখান পায় হত্যা করে তবে তিনটি শর্তে তাদেরকে নিস্তার দেয়া হবে, এক. যদি তারা তাওবা করে তথা ইসলাম গ্রহণ করে, দুই. নামায কায়েম করে, তিন. যাকাত আদায় করে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন:

]ولهذا اعتمد الصديق، رضي الله عنه، في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة، التي هي حق الله، عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" الحديث.

এ কারণেই আবু বকর সিদ্দীক (রাদিঃ) যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতের উপর ভিত্তি করেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। শুধু এই আমলগুলো তার থেকে পাওয়া যাওয়ার শর্তেই তার বিরুদ্ধে কিতাল নিষিদ্ধ হবে। অর্থাৎ তারা ইসলামে প্রবেশ করবে ও তার ওয়াজিবাতগুলো আদায় করবে। তিনি সর্বোচ্চ ওয়াজিবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াজিবগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। কেননা কালিমায়ে শাহাদাতের পর

সর্বোত্তম ইবাদাত হলো নামাজ। আর এটি আল্লাহতা'আলার হক্ব। আর এর পরে হলো যাকাত যার দ্বারা দরিদ্র ও অভাবীরা উপকৃত হয়। আর এটি মাখলুকের সাথে সম্পর্কিত সর্বোত্তম ইবাদাত। আর এ কারণেই অনেক স্থানেই নামায ও যাকাতকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহাইনে এসেছে ইবনে উমর (রাদিঃ) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আদিষ্ট হয়েছি, ততক্ষণ যাতে আমি মানুষদের সাথে কিতাল চালিয়ে যাই যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহতা'আলার রসূল। এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১১১)

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন:

[وفي هذه الآية، دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه]

আর এ আয়াতই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি নামায বা যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকবে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে যতক্ষণ না সে তা আদায় করে। যেমনটি আবু বকর (রাদিঃ) এর দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন। (তাফসীরে সাদী, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৩২৯)

আল্লামা ইবনে আরাবী (রহঃ)বলেন:

فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْأُمَةُ عَلَى أَنْ مَنْ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ يُحَارَبُ ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى الْعَمَلِ بِالرِّبَا ، وَعَلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. (أحكام القرآن : 2 / 134).

উম্মাহ একমত পোষণ করেছেন যে, যে পাপ করবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে৷ যেমন কোনো শহরবাসী যদি সুদি লেনদেনের ব্যাপারে একমত পোষণ করে অথবা জুম'আ ও জামাত তরকের ব্যাপারে একমত পোষণ করে৷ (আহকামুল কোরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:১৩৪)

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন:

الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه (الموطأ : 3809/2).

আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার ফরহসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ফরজের ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, ফলে মুসলমানেরা তার থেকে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়না, তাহলে মুসলমানদের দায়িত্ব হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা সম্ভব হয়৷(আল-মুয়াত্তা, খন্ড:২, পৃষ্ঠা:৩৮০৯)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)বলেন:

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا

মুসলিমদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান থেকে বিরত থাকে, মুসলিম জাতির সকল ইমামদের মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় না করে তাহলে নামাজ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে।(মাজমুয়ুল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন:

إذا امتنعوا عن إقامة الفرض، نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وأما السنن نحو صلاة العيد، وصلاة الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن.

যদি কোনো সম্প্রদায় ফরজ আদায় ছেড়ে দেয়, যেমন জুমু‘আ ও অন্যান্য সকল ফরজ নামাজ আথবা যাকাত আদায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি কোনো একজন ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তাকে প্রহার করবো। আর সুন্নত সমূহ

যেমন ঈদ ও জুম‘আর নামাজ, আযান, {যদি ছেড়ে দেয়} তাহলে আমি তাদেরকে আদেশ দেবো ও প্রহার করবো, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, যাতে ফরজ ও সুন্নত সমূহের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। (আল-মুহিতুল বোরহানি খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৯৫)

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন:

إذا اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته، وكذلك سائر السنن.

যদি কোনো শহরের অধিবাসীরা আযান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। আর যদি কোনো একজন ছেড়ে দেয় আমি তাকে প্রহার করবো ও গ্রেফতার করে রাখবো। একই হুকুম অন্যান্য সকল সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।(আল-মুহিতুল বোরহানি খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৪৯৫)

আল্লামা জাস্সাস (রহঃ) বলেন:

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة لموافقة من الصحابة إياه على شيئين أحدهما الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها فانتظموا به معنيين

أحدهما الامتناع من قبول أمر الله تعالى وذلك كفر والآخر الامتناع من أداء الصدقات المفروضة في أموالهم إلى الإمام فكان قتاله إياهم للأمرين جميعا ولذلك قال لو منعوني عقالا وفي بعض الأخبار عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ص - لقاتلتهم عليه فإنما قلنا أنهم كانوا كفارا ممتنعين من قبول فرض الزكاة لأن الصحابة سموهم أهل الردة وهذه السمة لازمة لهم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم ولو لم يكونوا مرتدين لما سار فيهم هذه السيرة وذلك شيء لم يختلف فيه الصدر الأول ولا من بعدهم من المسلمين أعني في أن القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا أهل الردة

আবু বকর (রাদিঃ) সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য অনুসারে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করেছিলেন দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। এক.

কুফর। দুই. যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি। কেননা তারা যাকাতের ফরজিয়্যাতকে কবূল ও তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে দু'টি কারণ একত্রিত হয়েছে। এক. আল্লাহতা'আলার আদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি। আর এটি কুফর। দুই. তাদের সম্পদের মধ্যে যে ফরজ সদকা রয়েছে তা ইমামকে প্রদান করতে অস্বীকৃতি।

সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ উভয় কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: যদি তারা আমাকে একটি লাগাম দেয়া থেকে বিরত থাকে , কোনো রেওয়াতে এসেছে একটি ছাগল ছানা দেয়া থেকে বিরত থাকে, যা তারা রসূলসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আদায় করতো, এই করণেও অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো।

আমরা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছি, যারা যাকাতের ফরজিয়্যাত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কেননা সাহাবায়ে কেরামগণ তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই সম্বোধন আজ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে বলবৎ আছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্ত্রী ও সন্তাদেরকে বন্দী করেছিলেন। যদি তারা মুরতাদ না হতো তাহলে তাদের সাথে এই আচরণ করা হতো না। আর এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে প্রথম যুগ ও তার পরবর্তী যুগের মুসলমানগণ দ্বিমত পোষণ করেননি। অর্থাৎ এ বিষয়ে আবু বকর (রাদিঃ) যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তারা মুরতাদ ছিল। (আহকামুল কোরআন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৫৭২)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন:

وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقا يجب عليه لآدمي وجب قتاله فإن أتى القتل على نفسه فدمه هدر

সকল উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো ফরজ আদায় না করার পক্ষে যুদ্ধ আরাম্ভ করবে, অথবা অন্য কারো প্রাপ্য হক্ব দেয়া থেকে বিরত থাকবে তার বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হবে। আর যদি সে নিহত হয় তাহলে তার রক্তপণ দিতে হবেনা। (উমদাতুল ক্বারি,খন্ড:৩৪, পৃষ্ঠা:৪১০)

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহঃ)বলেন:

[وفي الظهيرية، والولوالجية، والتجنيس وغيرها: أهل قرية اجتمعوا على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يمتنعوا قاتلهم، وإن امتنعوا عن أداء السنن فجواب أئمة بخارى: بأن الإمام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض؛ لما روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لو أن أهل بلدة أنكروا سنة السواك لقاتلتهم كما نقاتل المرتدين وَفِي الْعُمْدَةِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ يُؤَدِّبُهُمْ الْإِمَامُ وَعَلَى تَرْكِ السُّنَنِ يُقَاتِلُهُمْ زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّ هَذَا إذَا تَرَكَهَا جَفَاءً لَكِنْ رَآهَا حَقًّا فَإِنْ لَمْ يَرَهَا حَقًّا يُكَفَّرُ](البحر الرائق : 4 / 192).

জহিরিয়্যাহ, ওলওজিয়্যাহ, তাজনিস ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখ আছে, কোনো এলাকার অধিবাসীরা যদি বিতরের নামায ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে এবং বন্দী করবে। যদি তারা উক্ত কর্ম থেকে বিরত না হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। আর যদি তারা সুনান ছেড়ে দেয় তাহলে আয়িম্মায়ে বোখারার মতো হলো তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করবে যেমন কিতাল করবে তারা যদি ফরজ ছেড়ে দেয়। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি কোনো শহরবাসী মিসওয়াকের সুন্নাতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো যেমন আমরা কিতাল করে থাকি মুরতাদদের বিরুদ্ধে। 'উমদার' মধ্যে এসেছে যদি কোনো সম্প্রদায় আযান ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে তবে ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে, আর যদি সুন্নাত ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। 'খোলাসার' মধ্যে আরো বৃদ্ধি করেছে, এটি তখন যখন সে তা ত্যাগ করবে বিরূপ ভাব নিয়ে তবে তাকে হক্ব হিসাবে জানবে। আর যদি তাকে হক্বই মনে না করে তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে।(আল-বাহরুর রায়েক, খন্ড:৪, পৃষ্ঠা:১৯২)

<u>ফুকাহাগণের উপরক্ত ফতওয়ার সারমর্ম:</u>

এক. যদি কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম তাদেরকে গ্রেফতার করে শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তারা শক্তিধর হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হলো তাদের বিরুদ্ধে

ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে।

দুই. যদি কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোনো অকাট্য ফরজ ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে বন্দী করে শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যদি কোনো দল বা সম্প্রদায় সংঘবদ্ধভাবে এমনটি করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা উম্মাহর উপর ফরজ হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে, যদিও তারা মুখে উক্ত বিধানকে স্বীকার করে।

তিন. কোনো সম্প্রদায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো সুন্নাহ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও সেটিকে সুন্নাহ হিসাবে স্বীকার করে, তথাপি ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) সহ অনেক ফকীহগণের মত হলো তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করা হবে।

চার. কোনো শাসক যদি জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে মুসলমানদের থেকে 'কর' গ্রহণ করে তাহলে ইমাম জাস্সাস (রহঃ) এর মত হলো, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুমতি রয়েছে তাকে ও তার অনুসারীদেরকে এবং 'কর' গ্রহণে সাহায্যকারীদেরকে যেখানে যেভাবে পাবে হত্যা করবে।

<u>কেয়াস:</u> ইমামগণের মত হলো, কোনো সম্প্রদায় যদি নামাজ আদায় না করে, যাকাত প্রদান না করে, অথবা সুদি লেনদেন করে, মুসলমানদের থেকে 'কর' গ্রহণ করে, আর এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করে, তাহলে উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা।

আর কেউ যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে, যাকাত দেয়া থেকে শুধু নিজেরাই বিরত থাকে, সুদ শুধু নিজেরাই খায় এমনটি নয় বরং রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাতের বিধানকে অকার্যকর করে, সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করে এবং এ ব্যবস্থাকে সর্বোন্নত জীবনব্যবস্থা বলে দাবি করে জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেয়, তাহলে সে কিভাবে মুসলমান থাকে?! আর তার বিরুদ্ধেঅস্ত্র ধারণ যে উম্মাহর উপর ওয়াজিব সেটি তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

আর এটা কি শুধু এক-দু'টি বিধানের ক্ষেত্রে?!! শত-শত বিধানের ক্ষেত্রে তারা একই পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা পুরো ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ইহুদী-খ্রীষ্টান ও মুশরিকদের দ্বারা রচিত তাগূতী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত তাগূত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে শুধু তাদেরই সংশয় থাকতে পারে আল্লাহতা'আলা যাদেরকে ওহীর নূর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে তাদের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে।

ইতিহাস কী বলে?

এক

হুসাইন (রাদিঃ)

জান্নাতী যুবকদের সর্দার রসূলসল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদরের নাতী হুসাইন (রাদিঃ) দৌলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এবং এতে তিনি

শাহাদত বরণ করেন। অথচ ইয়াজিদ কাফের ছিলনা, কিন্তু দ্বীনের কিছু বিষয়ে কম-বেশী করেছিল যা জান্নাতের যুবকদের সর্দার সহ্য করতে পারেন নি, তাই তিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

দুই

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদিঃ)

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাদিঃ) একজন তরুন সাহাবা এবং মুজতাহিদ ফকীহ ছিলেন। তিনি তৎকালীন জালিম উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রে ধারণ করে ছিলেন। সর্ব শেষ তিনি জালিম শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে মারওয়ানের জালিম গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।

তিন

জায়েদ বিন আলী (রহঃ)

জায়েদ বিন আলী (রহঃ) হলেন ইমাম হুসাঈন (রাদিঃ) এর নাতী। একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। ইমাম জাফর সাদিক (রহঃ) এর আপন চাচা। ইমাম আবু হানীফা (রাদীঃ) এর সম্মানিত উস্তায।

তিনি উমাইয়া শাসক ইসাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তলন করেন। এবং শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যান।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁকে ইমামে হক বলে আখ্যায়িত করেন। মাল দিয়ে উক্ত জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন, নিজে স্ব-শরীরে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে ওযর পেশ করেন। এ জিহাদকে তিনি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন।

চার

আন-নাফসুস ঝাকিইয়া মুহাম্মাদ (রহঃ)

আন-নাফসুস ঝাকিইয়া মুহাম্মাদ (রহঃ) ছিলেন হাসান(রাদিঃ) এর নাতী আব্দুল্লাহ (রহঃ)এর ছেলে।তিনি ও তার ভাই ইব্রাহীম (রহঃ) আব্বাসী শাসক খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে জালিমের হাতে সাহাদাত বরণ করেন।

পাঁচ

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)তৎকালীন জালিম উমাইয়া এবং আব্বাসী শাসকদের বিরুদ্ধে অব অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে শরয়ী ওয়াজিব আখ্যায়িত করে জনগণকে ফতওয়া প্রদান করেন। মাল দ্বারা উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত জিহাদকে বদরের সাথে তুলোনা করেন। ৫০ টি হজ্বের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। (দেখুন: মানাকিবুল ইমামিল আজাম, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:২৬০/২৬১। আহকামুল কুরআন, খন্ড:১, পৃষ্ঠা:৭০)

ছয়

উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে আব্দুর রহমান ইবনে আস-আছের যুদ্ধ

জালিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে আব্দুর রহমান বিন আস-আছ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। উক্ত যুদ্ধে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ ফকিহ তাবিয়ীগণ অংশ গ্রহণ করেন। যারা ছিলেন উম্মাহর সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। নবুওয়াতের নিকটতম শতাব্দীর উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। যাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। যাদের মাঝে ছিলেন- আবি লায়লা, আস-শাবী, আবুল বুখতারী, সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুমুল্লাহু তায়ালা এর মতো উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ফকীহগণ। তাদের মাঝে অনেকেই উক্ত জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।

সাত

উক্ত জিহাদের ব্যাপারে তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ ফকিহ তাবিয়ীগণ (রহঃ) এর অভিমতঃ

এক

ফকীহ আবী লায়লা (রহঃ) এর অভিমতঃ

তৎকালীন জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে আবী লায়লা (রহঃ) বলেনঃ

يا معشر القراء إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشأم أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ ومن أنكر بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه اليقين

ওহে জ্ঞানীগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে পলায়ন করবে সেই সর্ব নিকৃষ্ট বাক্তি হিসাবে গণ্য হবে।সলেহীনদের মাঝে আল্লাহ তালা আলী (রাদিঃ) এর মর্যাদা বুলন্দ

করুন। তাঁকে সুহাদা ও সিদ্দিকিন্দের মাঝে সর্বচ্চ প্রতিদান দান করুন। শাম বাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বীন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি... ওহে মুমিনগণ! যখন কেউ দেখবে সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে, পাপের দিকে আহবান করা হচ্ছে অতঃপর অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে সে নিরাপদ থাকবে ও মুক্তি পাবে। আর যে মুখ দ্বারা তার বিরোধিতা করবে সে প্রতিদান পাবে, সে তার সাথীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। আর যে তার বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে যাতে আল্লাহ তালার কালিমা বুলন্দ হয় আর জালিমদের কালিমা অবনত হয়, সেই ঐ বেক্তি যে হেদায়েতের পথ অবলম্বন করেছে, অন্তর কে ইয়াকীন (বিশ্বাস)দ্বারা আলকিত করেছে।সয়া

দুই

শাবী (রহঃ) এর অভিমাত

يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم فليكن بهم البدار

ওহে মুসলিমগণ! আপনারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করার ব্যাপারে আপনাদের মাঝে সামান্য সংশয়ও যাতে কাজ না করে। আল্লাহর শপথ! পৃথিবীর বুকে বিচারকার্যে তাদের চেয়ে বড় জালিম ও অন্যায়কারী আমার জানামত, বিদ্যমান নেই।

তিন

আবুল বুখতারী (রহঃ) এর অভিমত

قاتلوهم على دينكم ودنياكم فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم

তোমরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করো। আল্লাহর শপথ! তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, নিশ্চিত তারা তোমাদের দ্বীনকে ধ্বংস করবে, তোমাদের দুনিয়াকে নস্যাৎ করবে।

চার

সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) এর অভিমত

قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة

বিচারকার্যে জুলুমের বিরুদ্ধে, দ্বীনের ব্যাপারে ঔধ্যত্বার বিরুদ্ধে, দুর্বলদেরকে লাঞ্চিত করার কারণে, নামাযকে ধ্বংস করার কারণে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

[দেখুনঃ তারিখুত তবারী-৩/৩৩৫]

[উল্লেখ্য উপরক্ত প্রতিটি শাসক জালিম ছিল, কাফের নয়। তথাপি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ অনেক ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। আমাদের এখানে এই তারিখ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলোকে শরয়ী মাপকাঠিতে তুলে ওজন করা, এগুলো পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে আলোচনা করা, আল্লাহতা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা সম্মানিত পাঠকের সামনে এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, যে জালিমদের

ব্যাপারে সালাফদের মধ্য থেকে অনেকের আমল ছিল এই, সুতরাং শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে উম্মাহর উপর কত বেশী দায়িত্ব বর্তায়, তা যাতে আমরা বুঝতে পারি]

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিম দেশের শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায়, সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, তাহলে সে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং তার স্থানে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ইমাম নিযুক্ত করা মুসলমান জনসাধারণের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে এই উম্মাতের মুফাসসিরীন, ফুকাহা ও সকল মাজহাব-মাছলাক্ব এর ওলামায়ে-কেরামগণের একমত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেনো মুসলিম উম্মাহকে সঠিক আমল করার তৌফিক দান করেন।